ATHENA, VOLUME VII, JULY 2023 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 169–173
www.athenajournalcbm.in

বুনিয়াদি শিক্ষা ভাবনায় মহাত্মা গান্ধী

পায়েল কুণ্ডু*

প্রাপ্ত: ২৮/০২/২০২৩ পরিমার্জন: ০৭/০৪/২০২৩ গৃহীত: ২৯/০৫/২০২৩

সারসংক্ষেপ: *শিক্ষা হল এমন প্রক্রিয়া যা মানুষের দেহ, মন ও আত্মার পূর্ণ বিকাশে সহায়ক। তৎকালীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজি এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছেন, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা হয়ে উঠবে স্বনির্ভর। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করে গান্ধী বলেন, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পুঁথিগত এবং তার মাধ্যমে আত্মবিকাশের কোনো সুযোগ নেই, তা মানুষকে যান্ত্রিক করে তোলে। বরং ভারতবর্ষের মতো দেশের পক্ষে প্রয়োজন সর্বস্তরের মানুষের জন্য বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা। তবে, এই বুনিয়াদি শিক্ষা হতে হবে সার্বজনীন, বিনামূল্যে বা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক। গান্ধীজি এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যে শিক্ষার জন্য ব্যয়িত অর্থের আনুকূল্যের অভাবই অনেককে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে। সেই কারণে তিনি শিক্ষাকে স্বনির্ভর করতে সচেষ্ট হন অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি অর্থ উপার্জনের পথকেও উন্মুক্ত রাখবে। এর ফলে তারা হয়ে উঠবে স্বনির্ভর বা স্বাবলম্বী। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজি বিবেকানন্দের ন্যায় শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।*

সূচক শব্দ: *বুনিয়াদি শিক্ষা, অহিংসা, মাতৃভাষা, পুঁথিগত শিক্ষা, ধর্ম, হস্তশিল্প, বেকারত্ব, ন্যায়পরায়ণতা।*

---

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ।
e-mail: 1993payelkundu@gmail.com

শিক্ষা হল জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিক অভ্যাস অর্জনের প্রক্রিয়া। শাশ্বতভাবে শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয় শিক্ষা হল সেই পদ্ধতি যা ব্যক্তির দেহ, মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়ক। শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল মানুষের আত্মিক উন্নতি ও আত্মবিকাশের পথ প্রশস্ত করা, যা তাদের জীবন চালনার জন্য অত্যাবশ্যক। শিক্ষা একদিকে যেমন মানবজীবনের সমস্যাগুলিকে একাকী অতিক্রম করতে শেখায়, অন্যদিকে কিভাবে উপার্জন করে স্বাবলম্বী বা স্বনির্ভর হবে তা শিখতে সহায়তা করে –এই দুইয়েরই বাস্তবিক প্রকাশ যেন মহাত্মা গান্ধীর দর্শনে পরিলক্ষিত হয়েছে। গান্ধীজি তৎকালীন ভারতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা হয়ে উঠবে স্বনির্ভর। যত বেশি করে তারা জ্ঞান অর্জন করবে তত বেশি করে তারা কর্মজীবনে আরো ভালো কিছু অর্জনের সুযোগ পাবে। তিনি শিক্ষাকে উৎপাদনধর্মী ও সমাজ জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে শিক্ষার অর্থ— 'Education for Gandhi involved the training of mind, will and desires'.[১] শিক্ষা মানুষের মনকে এমন ভাবে তৈরি করে দেয় কঠিন সময় অবিচলিত থেকে সে যেন নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে পারে। শিক্ষা সম্পর্কিত তাঁর এরূপ ধারণা টলস্টয়-এর সান্নিধ্যেই গড়ে উঠেছিল এবং তাঁর শিক্ষাচিন্তায় বুনিয়াদি শিক্ষার পূর্ণ প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। গান্ধীর এই শিক্ষা সংক্রান্ত ধারণা মূলত তাঁর দর্শনের মূল নীতি অহিংসা ও সত্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। গান্ধীর দর্শনে এমন এক মৌলিক শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন যা জ্ঞান তৈরি করে, আত্মবিশ্বাস তৈরি করে এবং সব বাধা দূর করে সুযোগের দরজা উন্মুক্ত করে। 'নিছক সাক্ষরতাও বিদ্যার্জন নয়, বাস্তব জীবনের জন্য শিক্ষাই একজনকে মানুষ করে তোলে'।[২] শিক্ষা শিশুদের ক্ষেত্রে উন্নত জীবনের দরজা খোলার এক চাবিকাঠি। একটি শিশু তার জীবনের প্রথম শিক্ষা অর্জন করে তার পরিবার থেকে। পিতা-মাতা তার জীবনের প্রথম শিক্ষক। পরবর্তীতে সে স্কুল থেকে শেখার অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে। মৌলিক শিক্ষা একটি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করতে, বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে শেখায়, যাতে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে পারে, দক্ষতা বিকাশ করতে পারে এবং সর্বোপরি সৃজনশীল হতে শেখায়। যাতে শিশু বড় হয়ে এক উন্নত মানের জীবন গড়তে মৌলিক শিক্ষাকে ব্যবহার করতে পারে।

তবে আধুনিক ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা মানবিক ও শান্তিপূর্ণ সামাজিক জীবন অর্জনে অক্ষম। শিক্ষা যেন কখনো কখনো শুধু অভিজাতিক রূপে প্রতিভাত হয়। তখন শিক্ষা হয়ে ওঠে সামাজিক বিচ্ছেদ ও জটিলতা সৃষ্টির বড় কারণ। সে ক্ষেত্রে সামাজিক কিছু পরিবর্তন আনতে হলে প্রয়োজন সবার জন্য সঠিক ও মানসম্মত শিক্ষা। এই প্রেক্ষাপটে গান্ধীজি মৌলিক শিক্ষার পরিকল্পনা করেন, যা নতুন সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিকল্প পন্থা। গান্ধীজির বিশেষত্ব এখানেই যে, শোষণ ও কর্তৃত্ব বিহীন অহিংস সত্য সমাজ গঠনের লক্ষ্যে তিনি জীবজগৎ ও শিক্ষা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে একটি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বহন করতেন। মৌলিক শিক্ষার উপরে গান্ধীজি তাঁর নীতি সত্য, অহিংসা, শান্তি ও প্রেমের ধারণা দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হয়। গান্ধীজি যেহেতু জীবনের গুণগত উৎকর্ষতা অর্জন ও জীবনকে অর্থবহ করতেই আগ্রহী ছিলেন, সেহেতু সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতি তাঁর ভাবনা স্বাভাবিক গতিতেই ধাবিত হয়েছে। গান্ধী কখনই চাননি কেবল প্রচলিত পুঁথিগত শিক্ষার জোরে সমাজের উচ্চবৃত্তীয় মানুষেরা সামাজিক ক্ষমতা করায়ত্ত করে রাখবে এবং তথাকথিত পুঁথিগত শিক্ষা না থাকার দোষে এক বিরাট সংখ্যক মানুষ সামাজিক ক্ষেত্রে চিরকাল বহিরাগত হয়েই কাটিয়ে দেবে। সুতরাং গান্ধীর বহুধা বিস্তৃত ভাবনাগুলি কেবল চিন্তার জগতে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তার মধ্যে বাস্তবতার এক ছাপ ছিল। তাঁর ভাবনায় এই নতুনত্বের উপস্থিতি চিরায়িত ধারণাগুলিকে নতুন মাত্রা দিতে সচেষ্ট থেকেছে। হাতে-কলমে কাজ করার যথার্থ অভিজ্ঞতার জোরেই তিনি পেরেছিলেন শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করতে। 'তবে আজকের মতো নিছক যান্ত্রিকতায় নয়, বিজ্ঞানসম্মত ভাবে শেখাতে হবে হস্তশিল্প। শিশু যাতে প্রতিটি প্রক্রিয়ার কি ও কেন জানতে পারে'।[৩] সেই জন্যই তিনি আগ্রহী হয়েছিলেন শিক্ষার বিষয়গত ও পদ্ধতিগত দিককে নতুন রূপে সাজিয়ে তুলতে। এর ফলে শিক্ষা শুধু যে সর্বজনগ্রাহ্য বা বোধ্য হবে তাই নয়, সব শ্রেণীর মানুষও একই পদ্ধতির অধীনে আসতে পারবে। পাশাপাশি এর সফল প্রয়োগের দ্বারা অর্থনৈতিক, জাতিগত ও বর্ণগত বৈষম্য দূর করে এক সর্বোদয় (অর্থাৎ সকলের

মঙ্গল) সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে, যা গান্ধীর দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য। এই পদ্ধতিকেই তিনি মূল শিক্ষা বলে অভিহিত করেছেন, যা মানুষকে কাঙ্ক্ষিত উন্নতির পথে নিয়ে যাবে। গান্ধীর শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা বলা হয় কারণ এই শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যক্তি ও জাতির ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ করে। জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ ভেদে সকল ভারতবাসীর জন্য ন্যূনতম শিক্ষা প্রদান করে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা জাতির মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তিনি মনে করতেন, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পুঁথিগত এবং তার মাধ্যমে আত্ম বিকাশের সুযোগ নেই। তিনি বলেছিলেন, বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান একটি মূল হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে শেখাতে হবে এবং হস্তশিল্পটি কি হবে তা নির্ভর করবে স্থানীয় প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে। হস্তশিল্প সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাতে দেশীয় উপকরণ ব্যবহৃত হবে যা কোনো না কোনো দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। যে কেউ হস্তশিল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন কৌশল শিখতে তাদের অবসর সময় ব্যয় করতে পারবে এবং তাদের নিজস্ব দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারবে। এটা স্বকর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করে, যা বর্তমান বেকারত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করা সর্বোত্তম পরিস্থিতি।

প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজির শিক্ষা ভাবনা তাঁর বিপ্লবী ভাবনার অবিচ্ছেদ্য অংশ স্বরূপ। শুধু ভাবনাতেই নয়, কাজের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন একজন সম্পূর্ণ বিপ্লবী। ১৯৩১ সালে লন্ডনে গোলটেবিল সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার অকার্যকারীতাকে নির্দেশ করেছিলেন এবং চিহ্নিত করেছিলেন ভারতীয় জনগণের মধ্যে সাক্ষরতার হার অনেকাংশ কম। গণশিক্ষার ক্ষেত্রে এই করুণ পরিস্থিতির জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকারের নীতিকেই দায়ী করেছিলেন। তিনি মনে করতেন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পুঁথিগত এবং তার মাধ্যমে আত্ম বিকাশের সুযোগ নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে অপচয় এবং ইংরেজি শিক্ষার অত্যধিক প্রভাব ও শিক্ষায় উৎপাদনশীলতার অভাব গান্ধীজিকে বিশেষভাবে আঘাত করেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজি ১৯৩১ সালে 'wardha' পরিকল্পনায় তাঁর মৌলিক শিক্ষা চিন্তাকে প্রকাশ করেন। তাঁর এই শিক্ষা চিন্তা 'Naitalim' নামে পরিচিত। গান্ধীর মৌলিক শিক্ষা 'learning by doing' এই মৌলিক নীতির ওপর ভিত্তি করে হয়েছিল।

গান্ধীর দর্শনানুসারে মৌলিক শিক্ষা বা বুনিয়াদি শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হল—সাত বছর থেকে চোদ্দ বছর বয়সী সকল ছেলে ও মেয়েদের জন্য সার্বজনীন, বিনামূল্যে বা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার্জন হওয়া উচিত। কারণ শিক্ষার দ্বারাই একমাত্র একটা শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। শুধু তাই নয়, গান্ধী মতে মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন যে, 'প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষাতেই হতে হবে কারণ শিশু প্রথম শিক্ষা পায় তার মায়ের কাছে। মাতৃদুগ্ধ যেমন স্বাভাবিকভাবে শিশুর দেহের উন্নতি সাধনে সহায়তা করে, ঠিক তেমনি মাতৃভাষা কাজ করে মানুষের মানসিকতা গঠনে'।[৪] মাতৃভাষার ওপর ভিত্তি করে পাঠক্রম আরো ভালোভাবে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে, তার পাশাপাশি স্কুলের দিকেও একটি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠবে। একটি শিশুর ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিকাশের ক্ষেত্রে ভাষা বিশেষ করে মাতৃভাষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুদের মাতৃভাষার মাধ্যমে বিষয়ের ভিত দৃঢ় হলে তাদের যে কোনো ভাষায় জ্ঞান আহরণ সম্ভব এবং সে যেকোনো পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করার জন্য আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে।

গান্ধীজি সর্বদা বিবেচনা করতেন, অহিংসা শিক্ষার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। সত্য ও অহিংসা গান্ধীর দর্শনের মূল সূত্র। মৌলিক শিক্ষাও এই সত্য ও অহিংসার নীতির ওপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। তাঁর কাছে 'সত্যই ঈশ্বর (Truth is God) আবার ঈশ্বরই সত্য (God is Truth)'।[৫] তিনি বলেন আমি ভারতের জন্যই বেঁচে আছি এবং এর জন্যই মরব কারণ এটা সত্যের অংশ। একমাত্র স্বাধীন ভারতীয়রা সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারে। তিনি উল্লেখ করেছেন আমার এই দেশ প্রেম একচেটিয়া নয় এবং অন্য কোনো জাতিকে আঘাত করার জন্য নয়।

গান্ধীর মতে শিক্ষা হল সব থেকে শক্তিশালী অস্ত্র যা শিক্ষার্থীর প্রকৃত চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। শিক্ষার গুরুত্বের কথা বললেও তিনি বলেছেন শিক্ষা হতে হবে নৈতিকতার উপরে ভিত্তি করে। গান্ধীজি ছাত্রদের শিক্ষার অংশ হিসেবে

নৈতিকতা ও সততাকে অপরিহার্য বলে মনে করেন। একজন শিক্ষার্থী শিক্ষার ন্যায়পরায়তা দ্বারা তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ করতে সক্ষম। গান্ধী বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব প্রদান করে বলেন, 'সাধারণ শিক্ষা কেবল মনের যত্ন নেয় কিন্তু বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেহ, মন ও আত্মার উন্নয়নের দিকে নিয়ে যায়'।[৬] এই শিক্ষা যদিও সকলের কাছে হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা বলে পরিচিত, কিন্তু সেটা আংশিক সত্য। তার প্রচারিত এই অভিনব শিক্ষার গভীরতা অনেক বেশি যা নিহিত আছে ব্যক্তির সমস্ত রকম মানবিক কাজকর্মে সত্য ও প্রেম প্রয়োগ করার মধ্যে। 'গান্ধী পুঁথিগত দিকটির চেয়ে শিক্ষার সাংস্কৃতিক দিকটির ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন'।[৭]

গান্ধীজি 'learning by doing' নীতির ওপর জোর দিয়েছিলেন যা ব্যক্তির মনকে উদ্দীপিত করে সৃজনশীল ও সমালোচনা মূলক চিন্তা করতে সাহায্য করে। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে গান্ধীজি *হরিজন* পত্রিকায় লিখেছেন— 'By education I mean an all-round drawing out of the best in child and man-body, mind and spirit. Literacy is not the end of education nor even the beginning. It is only one of the means whereby man and woman can be educated. Literacy in itself is no education. I would therefore begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from moment it begins its training. Thus every school can be made self-supporting, the condition being that the State takes over the manufactures of these schools'.[৮]

গান্ধীজি নৈপুণ্য কেন্দ্রিক শিক্ষার ওপরে জোর দিয়ে সকল নাগরিককে শিক্ষিত করার কথা বলেছেন, যা ছিল ভারতীয় প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নৈপুণ্যকেন্দ্রিক শিক্ষা কর্মসংস্থান প্রদানে সক্ষম যা তাদেরকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী কোনো একটি নির্দিষ্ট শিল্পকে কেন্দ্র করে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। এই সমস্ত শিল্পকে কেন্দ্র করে তারা অর্থ উপার্জন করবে এবং নিজেদের শিক্ষার ব্যয় তারা নিজেরাই বহন করবে। গান্ধীজি এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যে শিক্ষার জন্য ব্যয়িত অর্থের আনুকুল্যের অভাবই অনেককে শিক্ষা পেতে বঞ্চিত করে। সে কারণে তিনি শিক্ষাকে 'স্বনির্ভর' করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। এর অর্থ এই যে, শিক্ষার্থীরা শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি অর্থ উপার্জনের পথকেও উন্মুক্ত রাখবে। এর দ্বারা তিনি যে কেবল কারিগরি শিক্ষাকে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন, তা কিন্তু নয়। এর তাৎপর্য অনেক গভীর ও ব্যাপক। মূলত তৎকালীন দেশীয় পরিস্থিতিতে এ বিষয়ে তাঁর ধারণাকে সুসংবদ্ধ করেছিল। তিনি আশা করেছিলেন যে এরূপ শিক্ষার দ্বারা প্রত্যেক মানুষ নিজ ব্যক্তিজীবনকেও স্বনির্ভর করতে পারবে।

প্রকৃত শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া যা মানুষের মধ্যে সহনশীলতা, সহযোগিতামূলক গুণগুলিকে ত্বরান্বিত করে, যা মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে। তিনি আরো বলেন, মৌলিক শিক্ষার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হল শিশুদের বিকাশের সাথে সাথে তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের বোধ তৈরি করা। ছাত্রদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত হতে হবে। সামাজিক পরিষেবাগুলি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। শিক্ষার দ্বারা সামাজিক মঙ্গল ও মানবিক দিক থেকে উন্নীত করতে হবে। গান্ধীর মৌলিক শিক্ষার লক্ষ্য সেবা ও আত্মত্যাগের অনুভবকে উৎসাহিত করা। তিনি বলেছেন, তোমার প্রতিদিনের কিছু সময় অন্যের জন্য নিয়োজিত করতে হবে।

গান্ধীজি ছিলেন একজন সত্যিকারের সমাজসেবক যিনি সমাজের প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তিনি সবসময় বলতেন আমরা যদি কিছু সামাজিক কাজ করতে চাই তাহলে আমাদের নিজে থেকে শুরু করা উচিত। গান্ধীজি প্রথম থেকেই অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা এবং নিরলসভাবে নির্মূল করার প্রচেষ্টায় রত ছিলেন। ব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্যরাও তাঁর চোখে সমান। তিনি প্রকাশ্যে উঁচু-নিচু বর্ণের ভেদাভেদের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। 'শতাব্দী প্রাচীন জাতিভেদ প্রথা ভাঙতে এবং হিন্দুধর্ম থেকে অস্পৃশ্যতার চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন'।[৯] তিনি অনুভব করেছেন, দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য জাতি, ধর্ম, লিঙ্গের ভেদাভেদ ভুলে সমাজের সকল স্তরে মানুষের জন্য ন্যূনতম শিক্ষা প্রয়োজন। বিশেষত নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বলেছেন, 'নারী শিক্ষা পুরুষদের শিক্ষা থেকে পৃথক হওয়া

উচিত কিনা আর কখন তা শুরু করা উচিত সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। তবে আমার দৃঢ় অভিমত, পুরুষের সমান সুযোগ মেয়েদের পাওয়া উচিত, এমনকি প্রয়োজনে বিশেষ সুযোগও'।[১০]

গান্ধীজির স্বপ্নের সমাজকে বাস্তবে রূপ দিতে আমাদের কর্তব্য সমস্ত মানুষের শিক্ষা পাবার সম অধিকারকে সুনিশ্চিত করা। প্রয়োজন বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন। তিনি মানুষকে এক সত্য সমাজের জন্য প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন, যে সমাজের মূল বাণী হবে সহযোগিতা। গান্ধীজির প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের কারুশিল্পের উপরে শিক্ষিত করে তাদের জীবিকা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা একই সাথে ভালো নাগরিকত্বের গুণাবলী বিকশিত করা। তাই গান্ধীর দৃষ্টিতে সুশিক্ষার মূলে থাকা আবশ্যক সংস্কৃতি ও নৈতিকতা। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় তরুণ প্রজন্মের সম্মুখে যে ঘোরতর সংকট, যে হারে শিক্ষিত বেকারত্বের পরিস্থিতি ত্বরান্বিত হচ্ছে তা রোধ করতে বর্তমান শিক্ষামূলক ব্যবস্থাকেও গান্ধীজির মৌলিক শিক্ষার ধারণায় সংস্কার করা উচিত। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাথমিক পর্যায়ে সংস্কার করতে হবে গান্ধীজির মৌলিক নীতির নৈতিক মূল্য ও কর্মসংস্থানের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামনে রেখে।

সূত্র নির্দেশ:

১. Parel, Anthony J., (2007). (Ed.). *Hind Swaraj and Other Writings*, Cambridge University Press India Pvt. Ltd., p. 100.

২. Nayyar, Pyarelal, (1947-2-2). (Ed.). *Harijan*, vol. 11, no. 1, p. 3.

৩. Desai, Mahadev, (1937-7-31). (Ed.). *Harijan*, vol. 5, no. 25, p. 197.

৪. মহাশ্বেতা দেবী, (১৯৯৪), (অনু.), *গান্ধী-মানস*, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, পৃ. ৩০৭-৩০৮।

৫. Gandhi, M. K., (1931-12-31). (Ed.). *Young India*, vol. 13, no. 53, p. 427.

৬. Nayyar, Pyarelal, (1947-11-9). (Ed.). *Harijan*, vol. 11, no. 41, p. 401.

৭. Nayyar, Pyarelal, (1946-5-5). (Ed.). *Harijan*, vol. 10, no. 13, p. 120.

৮. Desai, Mahadev, (1937-7-31). (Ed.). *Harijan*, vol. 5, no. 25, p. 197.

৯. Nayyar, Pyarelal, (1946-3-17). (Ed.). *Harijan*, vol. 10, no. 6, p. 42.

১০. Mashruwala, K. G., (1950-8-5). (Ed.). *Harijan*, vol. 14, no. 23, p. 195.